ঢাকা : প্রাণকেন্দ্র ও প্রাণের অন্বেষা

নজরুল ইসলাম

হাজার বছরের ঢাকা শহরের রাজধানী পরিচয়ের চারশো বছর পূর্তি উৎসব চলছে বেশ হইচই করে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষকদের পক্ষ থেকেই উৎসব পালনের ধারণাটির সূত্রপাত মনে করা যায়। সোসাইটির কার্যনির্বাহী সংসদের একজন সদস্য হিসেবে এর সঙ্গে আমার নিজেও সম্পৃক্ততা ছিঙ, স্বীকার করি। ঢাকার উন্নয়ন বিবর্তনের একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে এরকম উৎসবের প্রতি আমার স্বাভাবিক আগ্রহ রয়েছে। রাজধানী ঢাকার চারশো বছর পূর্তি পালনের যৌক্তিকতা নিয়ে ইতোমধ্যে কোনো কোনো পন্ডিত ব্যক্তি প্রশ্ন তুলেছেন, যে-শহরের নানা বাস্তু নিদর্শনের বয়সই কমপক্ষে ছয়শো বছর, অন্যান্য ঐতিহাসিক পূর্বসূরিতা আটশো বা হাজার বছর বা তারও চেয়ে বেশি, সে-শহরের রাজধানী পরিচয় মাত্র চারশো বছর, এ নিয়ে এতো মাতামাতি, হইচই করার কী আছে?

ঢাকা শহর এখন বাঙালি জাতির একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজধানী। এর আগে ছিল পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের একটি প্রাদেশিক রাজধানী (১৯৪৭-১৯৭১)। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ রাজ্যের প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ার অত্যন্ত স্বল্পকালীন (১৯০৫-১৯১১) অভিজ্ঞতা হয়েছিল ঢাকার। তার আগে দিল্লির মসনদের অধিকর্তা মুঘল সম্রাটদের বঙ্গ সুবেহর রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছিল ঢাকা। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুবেদার ইসলাম খান চিশ্‌চি ঢাকায় এসেছিলেন ১৬০৮ সালে এবং ১৬১০ সালে ঢাকা শহরকে নির্বাচন করেছিলেন সুবেহ বাংলার রাজধানী হিসেবে। সম্রাটের নামে এর নামকরণও করেছিলেন 'জাহাঙ্গীর নগর", যদিও পরবর্তীকালে নামটি খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল বলে প্রমাণ মেলে না। বরং ঢাকা তার পুরাতন নামেই পরিচিত হতে থাকে। অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, ঢাকা মুঘল প্রদেশের রাজধানী শহর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার আগে থেকেই একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শহর ছিল। তবে রাজধানী শহর নয়। মুঘল-পূর্ব সময়ে ঢাকা শহরে স্থায়ী বসত ছিল, পাকা ভবনাদি ছিল, এমনকী বিনত বিবির মসজিদ নামে খ্যাত নারিন্দার মসজিদটি যে ১৪৫৭ সালের দিকে নির্মিত হয়েছিল, শিলালিপিতে তার প্রমাণ রয়েছে। তৎকালীন ঢাকার অন্যান্য স্থায়ী স্থাপনার প্রমাণাদিও নাকি রয়েছে। তাছাড়া 'বায়ান্ন বাজার আর তেপ্পান্ন গরিল' শহর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার আগে থেকে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শহর ছিল। তবে রাজধানী শহর নয়। মুঘল-পূর্ব সময়ে ঢাকা শহরে স্থায়ী বসত ছিল, পাকা ভবনাদি ছিল, এমনকী বিনত বিবির শিলালিপিতে তার প্রমাণ রয়েছে। তৎকালীন ঢাকার অন্যান্য স্থায়ী স্থাপনার প্রমাণাদিও নাকি রয়েছে। তাছাড়া 'বায়ান্ন বাজার আর তেপ্পান্ন গলির' শহর বলে খ্যাত যে মুঘল-পূর্ব জনপদ, সে যে 'ঢাকা" তাও তো সাধারণমনে স্বীকৃত। প্রতিটি শহরের একটি 'প্রাণকেন্দ্র" থাকে এবং বলা হয়, প্রতিটি শহরের 'আত্মা' বা 'প্রাণ' ও থাকে, ইরেজিতে বলা হয় 'Every City has a soul of its own'। আজকের আধুনিক মহানগরেরও যেমন 'আত্মা' বা 'প্রাণ' আছে, অতীতকালের শহরেও তেমনি 'আত্মা' বা 'প্রাণ' ছিল। শহরের এই 'প্রাণ'বস্তু বা ধারণার হদিস করা খুব একটা সহজ কাজ নয়, তবে 'প্রাণকেন্দ্রে'র পরিচয় হয়তো খুঁজে পাওয়া যায়। আমরা বর্তমান নিবন্ধে মূলত বর্তমান ঢাকা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রের খোঁজ পাওয়া যায়। আমরা বর্তমান নিবন্ধে মূলত বর্তমান ঢাকা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রের খোঁজ করব। সম্ভব হলে নগরীর প্রাণেরও খোঁজ নেবার চেষ্টা করা যাবে। নগরের ভৌগোলিক 'প্রাণকেন্দ্র" একটি (বা একাধিক স্থাপন, ভৌগোলিক বা বাস্তুসত্তা, আর নগরীর 'প্রাণ" হলো তার কর্মকান্ড তথা অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ।

আমরা ঢাকা মহানগরীর বর্তমান 'প্রাণকেন্দ্র' ও প্রাণের পরিচয় জানবার আগে অতীতের প্রাণকেন্দ্রের খোঁজ নেবার একটু চেষ্টা করতে পারি।

মুঘল-পূর্ব যুগের ঢাকা ছিল (তৎকালীন সময়ের বিবেচনায়) একটি মাঝারি ধরনের বাণিজ্যিক শহর। বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে গড়ে উঠেছিল এই নদীবন্দর শহর। তখন এ-অঞ্চল সোনারগাঁও কেন্দ্রিক মুসলমান শাসনাধীন ছিল, তার আগে ছিল বিক্রমপুরকেন্দ্রিক হিন্দু শাসনাধীন। ঢাকার বিস্তৃতি ছিল বুড়িগঙ্গার তীরের পশ্চিমে বাবুবাজার, পূর্ব দোলাইখাল, উত্তরেও দোলাইখাল, ঢাকেশ্রবীর মন্দির বা বর্তমান বক্‌শী বাজার এলাকা। বড়জোর এক বর্গমাইল ছিল শহরের বিস্তার। তবে পশ্চিমে রায়েরবাজার এলাকাও মুঘল-পূর্ব ঢাকা শহরের বর্ধিত অংশ ছিল, আর দোলাইখালের উত্তর-পূর্ব ছিল নারিন্দা, যেখানে বিনত বিবির মসজিদ নির্মিত হয়েছিল (১৪৫৭ সালে)। বর্তমান জেলাখানার পশ্চিমে ১৪৫৯ সালের দিকে নির্মিত হয়েছিল নাসওয়াল্লাগলি মসজিদ। বর্তমান মিল ব্যারাকের কাছে নদীর উত্তরে অবস্থান ছিল বেগ মুরাদ খান দুর্গের। হযরত শাহ আলী বাগদাদীর মিরপুরের দরগা ও মসজিদ ১৪৭৭ সালে তাঁর মৃত্যুর আগের ব্যবস্থতা। তবে মিরপুরের দরগাহ আর তখনকার মূল শহরের উত্তর প্রান্তে অবিচ্ছিন্ন ক্রমবিস্তার ছিল বলে মনে হয় না।

এই যে মুঘল-পূর্ব ঢাকা নগর, তার প্রাণকেন্দ্র ছিল সম্ভবত বর্তমান বাংলাবাজার এলাকা। তবে এর আশপাশের বেশকিছু এলাকা যেমন তাঁতীবাজার, শাঁখারীবাজার, লক্ষ্মীবাজার এগুলোও প্রাণচঞ্চল ছিল মনে করা যায় (তবে এ-এলাকাগুলো এরকম নাম সম্ভবত চালু হয়েছিল মুঘল যুগের প্রথম দিক থেকে)। বাংলাবাজারই যে মুঘল-পূর্ব ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ছিল সেরকম অনুমান অযৌক্তিক হবে না, অবশ্য, বিভিন্ন মসজিদ, রগাহ ও মন্দিরকে কেন্দ্র করেও যে সে-সময়ে নগরীতে চাঞ্চল্য ছিল, তাও ধরে নেওয় যায়। তবে মুঘল -পূর্ব 'ঢাকা" সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুব একটা তথ্যনির্ভর নয়।

ঢাকা নগরী মুঘল-পর্ব যথেষ্ট দীর্ঘ, ১৬০৮ থেকেই এর শুরু বলা যায়। অর্থাৎ ইসলাম খাঁ চিশ্‌তির আগমনের সময় থেকে। আর ১৬১০ থেকে তো আনুষ্ঠানিকভাবে মুঘল বাংলা সুবেহর রাজধানী হিসাবে ঢাকার পরিচয়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে ১৯৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে, তবে ১৭৬৫ মধ্যবর্তী একশ পঞ্চান্ন বছর ঢাকা ছিল মুঘল শাসনাধীন। ১৬৩৯ সালে তৎকালীন সুবেদার শাহ সুজা বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন রাজমহলে (বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় স্থানান্তর করেন ১৬৬০ সালে। পুনরায় ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানা স্থানান্তরিত হয় ১৭১৭ সালে মুর্শিদাবাদে। তখন থেকে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের আগ পর্যন্ত ঢাকা শহর নেহাতই একজন নায়েব নাজিম বা ডেপুটি গভর্নরের শাসন-আসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে।

অর্থাৎ মুঘলদের বাংলা প্রদেশের পূর্ণাঙ্গ রাজধানী হিসাবে ঢাকা নগরের পরিচয় ছিল ১৬১৬-১৬৩৯ ও ১৬৬০-১৯১৭, মাত্র আশি সুবেদার শায়েস্তা খান (১৬৬৩-১৬৭৮ এবং ১৯৬৭-১৬৮৮)। তার সময়েই ঢাকা নগরীর মর্যাদা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঢাকা বিস্তৃত হয়েছিল এক বিশাল

ভৌগোলিক পরিসরে। দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা থেকে উত্তরে তেজগাঁও, এমনকী বিচ্ছিন্নভাবে টঙ্গী পর্যন্ত। আর পূর্বে গেণ্ডারিয়া থেকে পশ্চিমে তুরাগ নদী পর্যন্ত। জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল বিরাট রকম। শায়েস্তা খানের শাসনামলের অল্প কয়েক বছর পরের, অর্থাৎ ১৭০০ সালের দিকে ঢাকা নগরীর জনসংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য শোনা যায়। কোনো কোনো সূত্রে ১৭০০ সালের ঢাকার জনসংখ্যা নয় লাখ বলে উল্লেখ করেছেন। আমাদের কাছে এ-সংখ্যাটি খুব বেশি অতিরঞ্জন মনে হয়। বরং সেন্সাস অব গ্রেট সিটিজ অব দি ওয়ার্ল্ড নামক সাম্প্রতিক এক গ্রন্থে প্রদত্ত সংখ্যা দুই লাখকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হয়। তখনকার দিনের একটি নগরের জনসংখ্যা দুই লাখ বস্তুত খুবই বিশাল এবং সে-কারণে ঢাকা যে তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম জনবহুল নগর ছিল তা বলাই বাহুল্য।

ঢাকা শুধু পরাক্রমশালী মুঘল সাম্রাজ্যের বাংলা প্রদেশের রাজধানী শহরই ছিল না, ঢাকা ছিল সমকালীন বিশ্বের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাতির বণিকরা এখান ব্যবসা করতে এসেছে, ফ্যাক্টারি স্থাপন করেছে, উপাসনালয় নির্মাণ করেছে, স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে। এদের মধ্যে ছিল পর্তুগিজ, আর্মেনীয়, গ্রিক, ডাচ বা ওলন্দাজ, ফরাসি এবং অবশ্যই ইংরেজ বণিকগণ। ধর্মপ্রচারকরাও এসেছে। পাঠান, মুঘলরা তো আগেই এসেছেন এবং মুঘলরা তো শাসকগোষ্ঠীই ছিলেন।

মুঘল আমলের ঢাকা ছিল রাজধানী শহর ঢাকা। রাজধানীতে তাদের মূল অবস্থান ছিল বর্তমান চকবাজার ও জেলখানা এলাকায়। এটাই ছিল প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র। লালবাগ কেল্লা ছিল সুবেদার আযম শাহেব বাসস্থান। তিনিই এর নির্মাতা (১৬৭৮)। তিনি এর নাম রেখেছিলেন তার পিতা সম্রাট আওরঙ্গজেবের নামে 'কিলা আওরঙ্গবাদ নামে। অথাৎ রাজকীয় প্রাসাদ হিসেবে লালবাগ এলাকাই ছিল মুঘল শাসনের ঢাকার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। দুর্গটি তখন বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে অবস্থান করত। নদী অবশ্য পরবর্তীকালে দক্ষিণে সরে যেতে থাকে। নদীতীরে বিভিন্ন ইউরোপীয়দের, বিশেষ করে পর্তুগিজদের ব্যবসায়িক ও ধর্মীয় কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। মীর জুমলার সময়ে (বর্তমান) রমনা গেট নামে খ্যাত স্থানে নগর তোরণ নির্মিত হয়েছিল (১৬৬০-৬৩), শাহবাগ এলাকায় মুঘল শাসক শ্রেণির বাগানবাড়ি ছিল। দিলকুশা-মতিঝিলও ছিল মুঘলদের বাগানবাড়ি এলাকা। রমনার উদ্যান-শোভা মূলত মুঘল আমলেই গড়ে উঠেছিল।

মুঘল আমলের দীর্ঘ প্রায় শত বছরের শাসনামলের রাজধানী হিসেবে ঢাকার যে - অস্তিত্ব (১৬১০-১৭১৭) তার অধিকাংশ সময়েই ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ছিল চকবাজার ('পাদশাহী বাজার') এলাকা। ইতিহাসবিদ ঢাকা বিশেষজ্ঞ মুনতাসীর মামুনও চকবাজারকেই চিহ্নিত করেছেন মুঘল ঢাকার 'ব্যাবসাকেন্দ্র" ও 'সামাজিক মিলনকেন্দ্র' হিসেবে। ইউরোপীয় প্রাচীন ও মধ্যযুগের শহরের যেমন ছিল এগোরা, পিয়াজ, প্লাজা স্কোয়ার ইত্যাতি, চকবাজার্য ছিল অনেকটা সেরকম।

তবে অনুমান করা যায়, শাহ্ সুজার আমলে ১৬৪১ সালে নির্মিত ঈদগাহ ময়দানের কারণে বর্তমান ধানমণ্ডি এলাকাটিও তখন প্রাণচঞ্চল থাকত, বিশেষ করে ঈদের সময়। রমনা এলাকার নির্মিত কালীবাড়িও নিশ্চয় একটি আকর্ষণীয় স্থান ছিল, অন্তত হিন্দুদের জন্য। যেমন ছিল (প্রধানত) শিয়া মুসলমানদের প্রিয় স্থান ইমামবাড়া বা হোসিন দালান, মুঘল আমালে ফরাশগঞ্জের ইমামবাড়া। ফুলবাড়িয়া এলাকার বর্তমান হোসনি দালান ইমামবাড়া অবশ্য ব্রিটিশ আমলে নির্মিত।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, মুঘলরা ঢাকায় আসে ১৬০৮-এ, এসে একে বাংলার রাজধানী করে ১৬১০-এ, তাদের শাসনামলেই ১৬৩০-এর দশকে কাশ্মিরের ব্যবসায়ী আবদুল হাকিম ঢাকা আসেন। তার বংশধাররাই পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে, ঢাকার 'নবাব" নামে উপাধি লাভ করেন। আবদুল হাকিম প্রথমে ব্যবসা শুরু করেন মৌলভী বাজার এলাকায়, অর্থাৎ তৎকালীন ঢাকার প্রাণকেন্দ্র চকবাজারের কাছেই। পরে তার পরিবারের উত্তরসূরিরা বুড়িগঙ্গার পারে তাদের প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

মুঘলদের তুলনায় ঢাকার ব্রিটিশ শাসনকাল দীর্ঘতর ছিল। ১৭৬৫ থেকে ১৯৪৭ অর্থাৎ একশ বিরাশি বছর। এই দীর্ঘসময়ে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র অবশ্যই একই জায়গায় স্থির ছিল না। প্রথমদিকে চকবাজার-লালবাগ এলাকা অবশ্যই জমজমাট ছিল, বুড়িগঙ্গার তীর-সংলগ্ন এলাকাও ইউরোপীয়দের বাসস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে প্রাণচঞ্চল ছিল।

মুঘল আমলের একেবারে শুরু থেকেই ইউরোপীয় বণিকদের ব্যবসা-সূত্রে ঢাকায় আসতে শুরু করেছিল। প্রথমে আসতে পর্তুগিজরা (১৬১৬), তারপর ওলন্দাজ বা ডাচরা (১৬৬৩), তারপর ইংরেজরা (১৬৬৬-এর দিকে)। ফরাসিরা এসেছিল ১৬৮২ সালের দিকে। ইউরোপীয়দের একটি কেন্দ্র ছিল বর্তমান তেজগাঁও এলাকায়। তবে ইংরেজরা প্রথমে (বর্তমান) বাহাদুর শাহ পার্ক বা (আগের) ভিক্টোরিয়া পার্ক বা কলেজিয়েট স্কুল এলাকায় আস্তানা গড়ে। পড়ে বুড়িগঙ্গার তীরঘেঁষে গড়ে ওঠে তাদের বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য। বর্তমান আস্তানা ছিল। প্রশাসনিক, ব্যবসায়িক ও সামাজিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে ভিক্টোরিয়া পার্ক এলাকা বহুদিন পর্যন্ত প্রাধান্য রেখেছে। ১৮৬৪ সালে ঢাকা মিউনিসিপালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অবস্থানও ছিল একই এলাকায়, লক্ষ্মীবাজারে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের কারণে ঢাকা পূর্ব বাংলার রাজধানী হলেও বর্তমান কার্জন হল, হাইকোর্ট (তৎকালীন ছোট লাট ভবন) অর্থাৎ রমনা-নীলক্ষেত রূপান্তরিত হয় ঢাকার অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে। তবে কোর্ট এলাকা, জেলা প্রশাসকের এলাকা। ইত্যাদি গুরুত্ব বজায় রাখে, সদরঘাট এলাকাও অবশ্য ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঢাকার সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে নীলক্ষেত-রমনা এলাকা। অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলের ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ছিল একাধিক, বুড়িগঙ্গা নদীর তীর এলাকা, বিশেষ করে নবাববাড়ি, বাকল্যান্ড বাঁধ (১৮৬০ সালে নির্মিত), কোর্ট বা ভিক্টোরিয়া পার্ক এলাকা ও রমনা-নীলক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। এখন পুরনো ঢাকা বলতে যা বোঝায়, তার সবটাই অবশ্য প্রাণচঞ্চল থাকত বলেই মনে হয়। মূলত জনঘনত্বের কারণে এবং নানারকম ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব পালনের কারণে। ঈদ, পূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সময় ঢাকার জমজমাট পরিবেশ কল্পনীয়। ইতোমধ্যে নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ স্থাপিত হয়েছে (১৮৮৪), সুতরাং ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনও যে একটি ছোটখাটো গণমিলন কেন্দ্রের পরিচিতি পেয়ে থাকবে তা হতেই পারে। অবশ্য বুড়িগঙ্গা পারের আকর্ষণ তো ছিলই, চকবাজারের জৌলুসও নিশ্চয় অব্যাহত ছিল। ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশের 'আন্টাঘর' ছিল ইংরেজদের ক্লাবঘর। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর এর সামনের খোলা চত্বর হয়ে যায় 'করোনেশন পাক' বা 'ভিক্টোরিয়া পাক' (বর্তমানকালের বাহাদুর শাহ এলাকার খোলামেলা এরাগা, এসবই ছিল ব্রিটিশ আমলের ঢাকার প্রাণকেন্দ্র। ওয়ারী, পুরানো পল্টন এসব এলাকাও অভিজাত

আবাসিক এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ আমলের একেবারে শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক পরিচয় শেষ হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং ঢাকা পূর্ব বাংলা (পরে পূর্ব পাকিস্তান) প্রদেশের রাজধানী হিসেবে চিহ্নিত হয়। তখন ঢাকা ছিল আনুমানিক দুলাখ মানুষের একটি জেলা শহর, যার মূল ভিত্তি ছিঙ প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল- কলেজ শিক্ষা। শিল্প বলতে তেমন কিছুই ছিল না। তখন ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ছিল সদরঘাট এলাকা, ইসলামপুর-পাটুয়াটুলী হয়ে চকবাজার, সদরঘাট থেকে ভিক্টোরিয়া পার্ক, জনসন রোড, নবাবপুর রোড হয়ে ফুলবাড়িয়া তথা রেললাইন পার হয়ে রমনা-নীলক্ষেত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। তখনকার ঢাকার সাংস্কৃতিক প্রাণ বলতে সম্ভবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ ও কিছু সুপ্রতিষ্ঠিত হাইস্কুলের পরিবেশকে মনে করা যায়। দেশ বিভাগের আগে আগে কলকাতার মতো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়তো হয়েছে। তবে ঈদ, মহরম কিংবা দুর্গাপূজা উপলক্ষে ঢাকা নগর প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠত। সাহিত্য, সম্মেলন, নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। বলা প্রাসঙ্গিক, যে, ব্রিটিশ আমলের প্রথম থেকে সাহেবরা নানা কাজে এ-শহরে বসবাস করেছেন, তাদের আবাসিক এলাকা সিভিল লাইন নামে খ্যাত হতো, শেষদিকে রমনা ছিল সেরকম এলাকা।

পাকিস্তান আমলের তেইশ বছরে ঢাকার বিবর্তন ছিল বেশ লক্ষণীয়। নতুন দেশের প্রাদেশিক রাজধানী, অনেক কিছুরই প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা অনুভূত হয়। চাকরি, ট্রান্সফার, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ, সবকিছুই ব্যাপক চাহিদা রাখতে থাকে। উল্লেখযোগ্যভাবে অন্যান্য জেলা শহর বা মফস্বল শহর থেকে ভারতে চলেও যায় অনেকে। তারপরও ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছিল অভূতপূর্ব।

পূর্ব পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী দ্রুত অফিস-আদালত নির্মাণ, সরকারি কর্মচারীদের জন্য বাসস্থান ব্যবস্থা করা, বাণিজ্যকেন্দ্র, মার্কেট, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল, স্টেডিয়াম ইত্যাদি নানা কাজে হাত দেয়। এমনকী একটি নগর মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতিতেও হাত দেয়। ঢাকার প্রাণকেন্দ্র সম্প্রসারিত হয়, নবরূপে সাজানো হয় জিন্নাহ্ এভিন্যু, ঢাকা স্টেডিয়াম এলাকা, নিউমার্কেট ও শাহবাগ হোটেল এলাকা। পল্টন ময়দান রাজনৈতিক সভা-সমিতির মঞ্চ হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ঢাকা স্টেডিয়াম, টেস্ট ক্রিকেটের ভেন্যু হিসেবে। ফুটবলও জনপ্রিয় ছিল। গুলিস্তান সিনেমাও অনেকের জন্য নতুন এক প্রাণকেন্দ্র হয়েছিল। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো প্রাণকেন্দ্র ছিলই। ষাটের দশকে নিউমার্কেট বইপড়া ও রেস্তোরাঁ অনেক তরুণের জন্য আকর্ষণীয় ছিল।

ঢাকার নগর-বিকাশ ভালোই হয়েছিল ডিআইটির ১৯৫৯ সালের ২০ সাল মেয়াদি মহাপরিকল্পনাকে ভিত্তি করে। ধানমন্ডি, আগেই শুরু করা হয়েছে। তারপর বনানী ও গুলশান, এমনকী উত্তরার প্ল্যানও পাকিস্তান আমলেই হয়েছে। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা পরিকল্পিতভাবে আধুনিক কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকা হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছিল। কিন্তু মতিঝিল প্রাণচঞ্চল ছিল না, যেমনভাবে বাণিজ্যিক, নবাবপুর ছিল। কেননা, মতিঝিল ছিল সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিক, এখানে কোনো আবাসিক ব্যবস্থা ছিল না। অতএব সন্ধ্যার পর মতিঝিল হয়ে যেত প্রায় জনমানবশূন্য। এখনো প্রায় তেমনি রয়েছে। বরং জিন্নাহ এভিনুও যথেষ্ট উচ্ছল থাকতো, বেশ কিছু ভালো রেস্তোরাঁর কারণে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, সদরঘাট, এসব এলাকার প্রাণচাঞ্চল্য অটুট ছিল।

শহীদ মিনার ক্রমশ গুরুত্ব পেতে থাকে এবং পাকিস্তান আমলের শেষদিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ছায়ানটের কল্যাণে রমনার 'বটমূল" ও পহেলা বৈশাখের মিলনকেন্দ্র হয়ে যায়, মধ্যষাট থেকে। অন্যদিকে ধর্মপ্রাণদের জন্য বায়তুল মোকাররম ব্যস্ত কেন্দ্র। অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল কেনাকাটার মার্কেট, বিশেষ করে সোনার দোকান। নিউমার্কেট নিজের আকর্ষণ বাড়াতে পেরেছিল। আন্দোলনের শহর। ১৯৫২ -এর ভাষা - আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯-এর প্রাণকেন্দ্রও তাই, ১৯৭১-রে মার্চ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পল্টন ময়দান এবং ৭ মার্চ, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ — রমনা রেসকোর্স ময়দান রূপান্তরিত হয়েছিল ঢাকা তথা সারাদেশের প্রাণকেন্দ্রে। স্বাধীনতা - পরবর্তী সময়ে অবশ্য সরকারি সিদ্ধান্তেই (সম্ভবত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই) রেসকোর্স ময়দান উদ্যানে (সোহরাওয়াদী" উদ্যান) রূপান্তরিত হয়। কিছুটা অংশ শিশুপার্ক হিসেবে গড়ে তোলার শিশুদের জন্য আকর্ষণীয় হয়। শেখ হাসিনার সরকার আমলে সোহারাওয়ার্দী উদ্যানকে মুক্তিযুদ্ধের নানা স্মারকসহ নতুন আঙ্গিকে সাজাবার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এখনো কাজটি সম্পন্ন হয়নি, হলে পুনরায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ঢাকার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সেগুনবাগিচায় শিল্পকলা একাডেমী থেকে শুরু করে সাহবাগ, বাংলা একাডেমি, শহীদ মিনার ইত্যাদি সব মিলিয়ে ঢাকার 'সাংস্কৃতিক বলয়' নির্মাণের চমৎকার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এ-কাজটি এগোলে রমনা বাংলা একাডেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এই বৃহত্তর বহয়টিই উন্নীত হতো রাজধানী ঢাকার যথার্থ প্রাণকেন্দ্র। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে, সম্ভবত ১৯৭৩-এর দিকে, সরকারের গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে আরেকটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, বর্তমান ওসমানী উদ্যান এলাকাকে কেন্দ্র করে একটি 'সিভিক সেন্টার" বা 'গণকেন্দ্র' গড়ে তোলার। খসড়া পরিকল্পনা ও নকশাও করা হয়েছিল। কিন্তু ওসামানী স্মৃতি মিলনায়তন ও আশেপাশে কিছু উন্মুক্ত জায়গা নিয়ে উদ্যান ছাড়া আর তেমন কিছু করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে ঢাকা সিটি করপোরেশনের প্রশাসনিক ভবন লক্ষ্মীবাজার থেকে ফুলবাড়িয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছে বহুতল নগরভবনে, যার অবস্থান ওসামানী উদ্যানের সামনেই। দুটো মিলিয়ে একটি নগর-চত্বর গড়ে তোলার কথা চিন্তা করা যায়। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে কেন্দ্র করে রমনার সংস্কৃতি বলয় গড়ে তোলা যায়।

ইতোমধ্যে আরেকটি প্রাণকেন্দ্র গড়ে উঠেছে সংসদ ভবনকে কেন্দ্র করে। দক্ষিণ প্লাজায় মাঝে মধ্যে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিশাল সবুজ উদ্যানও আকর্ষণীয়। ক্রিসেন্ট লেক চন্দ্রিমা উদ্যান, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সমাধি ইত্যাদি অনেকের কাছেই আকর্ষণীয় স্থান। পাশের বাংলাদেশ-চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র নিজেই অনুষ্ঠানভিত্তিক প্রাণকেন্দ্র। দিন দিন এর আকর্ষণ বাড়ছে, তবে গোটা শেরে বাংলা নগরকে সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা করলে একটি সিভিক সেন্টার বা গণকেন্দ্রে রূপান্তর করা যায়। গত বছর ২৮ নভেম্বর রাজধানী ঢাকার চারশো বছর পূর্তি অনষ্ঠানমালায় শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব দক্ষিণ প্লাজাকে ঢাকার ভবিষ্যৎ প্রাণকেন্দ্রে রূপান্তরের কিছুটা সুযোগ করে দিয়েছে।

বর্তমান ঢাকার একক কোনো প্রাণকেন্দ্র নেই বলাই সমীচীন। বরং একাধিক কেন্দ্রকে আলাদা আলাদা করে 'প্রাণকেন্দ্র" ভাবা যায়। নিঃসন্দেহে শহীদ মিনার,বাংলা একাডেমী, টিএসসি তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, চারুকলা, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, জাদুঘর — এসব এলাকা ব্যস্ততম জনপ্রিয় প্রাণকেন্দ্র। এটি মূলত তরুণদেরই বড় বিচারকেন্দ্র এবং উদার মন-মানসিকতা তরুণদের। অন্যদিকে বায়তুল মোকাররম মসজিদ অথবা

কাকরাইল তাবলিক মসজিদ অন্য মনমানসিকতা অসংখ্য মানুষের প্রিয় জায়গা। মহিলাদের জন্য তেমন কোনো সাধারণ গণকেন্দ্র নেই, তাদের বরং নিউমার্কেট, বসুন্ধরা সিটি শপিংমল ধরনের জায়গাই প্রিয়।

বড় গণকেন্দ্র ঢাকায় তেমন না থাকলেও কিছু সড়ক নানা করণে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ধানমান্ডির ২৭ নম্বর রোড (বেঙ্গল গ্যালারি, এটসেটেরা, নন্দ ইত্যাদি, ও স্কুল, কলেজ, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, রেস্তোরাঁ), এলিফ্যান্ট রোড (শপিং), বনানীর কামাল আতাতুর্ক রোড (বিশ্ববিদ্যালয়, রেস্তোরাঁ, ফ্যাশন হাউস), গুলশান এভিন্যু (শপিং, রেস্তোরাঁ) ইত্যাদি কিছু উদারহরণ। ধানমন্ডি লেক, বিশেষ করে ৩২ নম্বর রোডেও সামনের চত্বর এবং রবীন্দ্রসরোবর অনেকের জন্যই আকর্ষণীয় জায়গা।

ঢাকা এখন মহানগর তথা মেগাসিটি। দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা থেকে উত্তরে টঙ্গী খাল পর্যন্ত সিটি করপোরেশনের বিস্তৃতি (মাঝখানে অবশ্য সেনানিবাস রয়েছে, যেকানে সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই)। এই সীমানার বাএির বৃহত্তর ঢাকা বা মেগাসিটি ঢাকার অন্যান্য অঞ্চল এবং কয়েকটি পৌরসভা, টঙ্গী, গাজীপুর, সাভার আর দক্ষিণ-পূর্বে নারায়ণগঞ্জ। এগুলোর কোনোটিতেই সুন্দর কোনো সিভিক সেন্টার বা গণকেন্দ্র নেই, এমনকী কারোরই কোনো পার্ক পর্যন্ত নেই। ঢাকা সিটি করপোরেশনের মধ্যেই আছে মিরপুর, লাখ লাখ মানুষ, সেখানেও কোনো সুপরিকল্পিত সিভিক সেন্টার নেই (তবে চিড়িয়াখানা ও উদ্যান রয়েছে)। উত্তরা মডেল টাউন, অথচ সেখানেও কোনো সিভিক সেন্টার নেই, আছে কিছু শপিংমল, আর দু-চারটে ছোট পার্ক, বড় মসজিদ। গুলশানেও গণকেন্দ্র নেই, আছে কিছু পার্ক এবং বিশাল জায়গা নিয়ে মসজিদ। কেন্দ্রীয় ঢাকা নগরীর বাইরে, উপকণ্ঠে আশুলিয়া কিংবা সাবারে গড়ে উঠছে বেশকিছু বিনোদনকেন্দ্র।

নিবন্ধের শুরুতে মনে করেছিলাম ঢাকা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্র এবং 'প্রাণ' বা 'আত্মা' দুটোরই খোঁজ করব। প্রাণকেন্দ্রের খোঁজ কিছুটা পাওয়া গেছে ঐতিহাসিকভাবেই। তবে বর্তমান ঢাকার প্রাণকেন্দ্র এক নয়, একাধিক। ইউরোপের সব শহরেই সিভিক সেন্টার জাতীয় কিছু একটা থাকেই, উত্তর আমেরিকার শহরেও, এমনকী ব্যাংকক (সায়াম স্কোয়ার অথবা ডেমোক্রেসি স্কোয়ার), কলকাতা (ময়দান, পার্ক স্ট্রিট, ডালহৌসি স্কোয়ার), দিল্লি (কনোট সার্কেল, জনপদ অথবা ইন্ডিয়া গেট), মুম্বাই (গেটওয়ে টু ইন্ডিয়া) ইত্যাদি শহরেও কিছু প্রাণকেন্দ্র আছে।

ঢাকার 'প্রাণ" বলতে কী বুঝব? অনেককিছুই হয়তো মনে হতে পারে। ঢাকাকে এককালে বলা হতো মসজিদের শহর। পরবর্তীকালে কিছুটা মেতিবাচক পরিচয় উঠে এসেছে, রিকশার শহর এবং বস্তির শহর হিসেবে। আর ঢাকা তো আন্দোলনের শহর (ভাষা-আন্দোলন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আন্দোলন, স্বৈরাচার নিপাত করার আন্দোলন)। আন্দোলন মিটিং-মিছিলেই ঢাকার প্রাণ, নাকি বাংলা একাডেমীর মাসব্যাপী একুশে বইমেলা ও শহীদ মিনারের পথনাটক, গান ও কবিতার আসর, নাকি পহেলা বৈশাখের রমনা, রবীন্দ্রসরোবর, নববর্ষের মিছিল, এসবেই ঢাকার প্রাণ? নাকি রমজান মাসের তারাবিহ নামাজ, জুমার দিনে মসজিদ-উপচানো জামাতের নামাজ, নাকি ঈদুল আজাহার কোরবানির মহাযজ্ঞ, নাকি চকবাজর, বেইলি রোড বা গাউছিয়া এবং হাজার হাজার স্পটে ইফতারির দোকানের ভিড়, নাকি ব্যান্ড মিউজিকের উদ্দামতা? মহানগরের চল্লিশ লাখ বস্তিবাসী কিংবা সমসংখ্যক দরিদ্র মানুষের কাছে ঢাকার প্রাণ কী?

'ঢাকা আমার ঢাকা', আবেগঘন প্রকাশ? আমাদের অনেকেই ঢাকা ছেড়ে বিদেশে গেলে ফিরে আসার জন্য মন উচাটন, কী পেতে চাই তখন, কী 'মিস' করি? ঢাকার যানজট নিশ্চয়ই নয়, অথবা গ্রীষ্মের তীব্র গরম এবং অসহনীয় লোডশেডিং অথবা বাড়িতে পানির অভাব, রাস্তার পাশের জমে থাকা জঞ্জাল। শহর থেকে নগর, নগর থেকে মহানগর, মহানগর থেকে এখন মেগাসিটি, কয়েক বছর পরে হয়ে যাবে মেটাসিটি, এই ঢাকার একক কোনো প্রাণকেন্দ্র বলে কিছু নেই, বরং আছে হয়তো অনেক কেন্দ্র, 'প্রাণ' অবশ্যই আছে। মেগাসিটির এক এক গোষ্ঠীর কাছে এক এক রকমের প্রাণ, তবে সবকিছুর ওপরে ঢাকার নিশ্চয়ই একটি পরিচয় রয়েছে। ঢাকা বাঙালির শহর, বাঙালিত্বই এর প্রধান পরিচয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পহেলা বৈশাখে এ-পরিচয়ের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ দেখা যায়। অবশ্য একথাও স্বীকার করতে হবে, বাঙালিত্বও পরিবর্তনশীল, ঢাকা যেমন পরিবর্তনশীল। আমাদের বাঙালিত্ব হয়তো আগের মতো খুব সেক্যুলার থাকতে পারছে না, এক ধরনের ইসলামি-বাঙালিত্বের পরিচয় পাচ্ছে, আবার আমাদের ক্ষুদ্র অথচ প্রভাবশালী এক অংশ পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির ব্যানার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তবু মানতেই হয়, পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দশটি মেগাসিটির একটি হলো ঢাকা, এখানকার মতো তে বেশি সমধর্মী সাংস্কৃতিক পরিচয় (বিশেষ করে ভাষার বিচারে) সম্ভবত আর কোনো মেগাসিটিতে নেই।